PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা
Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা
MONTHLY
মাসিক
Vol : XIII Issue : II, 15th, May, 2023 ১লা জৈষ্ঠ্য, ১৪৩০, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

এই মে মাস বিশ্ববাসী এবং বঙ্গবাসী উভয়ের কাছেই পবিত্র।

মাসের প্রথম দিনটি মে দিবস উপলক্ষে বিশ্বের শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষের কাছে এক উল্লেখযোগ্য দিন। বর্তমানে পুঁজির চরিত্র বদলের জন্য বৃহৎ কারখানার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু যে মানুষটি সকাল থকে রাত পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি খাবার বা পার্শেল দেওয়ার কাছে ব্যস্ত, যে মহিলাটি ভোরের ট্রেন ধরে শহরে এসে সারাদিন গৃহস্থালির কাজ সামাল দিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে বা ইটভাটায় দিবারাত্র খেটে মরে বা শিশুকে পিঠে বেঁধে চা বাগানে পাতা তোলে তাদের কাছে আটঘণ্টা কাজের দাবি কখনোই ফুরোবে না। অর্থাৎ মে দিবসের তাৎপর্য এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

মাসের প্রথমার্ধে আসে বাঙালির প্রাণের ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন—২৫ বৈশাখ। আজ কোন রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রয়োজন? গানের রবীন্দ্রনাথ? ১২ বছর বয়স থেকে শুরু করে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত যিনি প্রায় ২০০০ গান রচনা করেছিলেন। যদিও আমরা মাত্র ১০০ বড়জোর ২০০ গান শুনতে অভ্যস্ত। তবে কবি রবীন্দ্রনাধ? যিনি গীতাঞ্জনি কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পেয়েছিলেন, যে গীতাঞ্জলীর ১টি কপি রক্তমাখা অবস্থায় উদ্ধার হয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের রণাঙ্গনে নিহত এক ইংরেজ তরুণের বুক পকেটে। নাকি নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাংলা নাটককে সাবালকত্ব দান করেছেন। 'ডাকঘর' গান্ধীজিসহ আপামর ভারতীয়কে বাকরুদ্ধ করে রাখে আবার হিটলারের জার্মানিতে মৃত্যু পথযাত্রী কিছু কিশোর কিশোরীর মৃত্যু ভয় ভুলিয়ে দেয়। আমাদের মনে হয় সেই রবীন্দ্রনাথকে আজ দরকার যিনি ১৯২৬ সালে, কলকাতায় আর্য সমাজিদের ধর্মান্দোলনে সংঘটিত দাঙ্গার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লিখেছিলেন, 'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে/অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।' কিংবা সেই রবীন্দ্রনাথকে যিনি জেনারেল ডায়ারকৃত পাঞ্জাবের গণহত্যার বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন। দোর্দণ্ড প্রতাপ ইংরেজ শাসকের প্রদত্ত শিরোপা ফিরিয়ে দেন। ১৪৩০ এর বৈশাখে দাঁড়িয়ে তিনি বলবেন—

> 'তোরে নাহি করি ভয়,
> এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।'

আবার এই মে মাসের ১৯ তারিখে (১৯৬১) বরাক উপত্যকায় বাংলা তথা মাতৃভাষার স্বীকৃতির জন্য আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন এগারো জন তরুণ-তরুণী। তাদের স্মরণ করি।

ক্রিটিক

মৃগেন গাঁতাইত

ক্রিটিক হওয়াটা সবচেয়ে সহজ কাজ। যেহেতু সহজ কাজ তাই কাজের মানট সব সময়ে উচ্চ হয় না। ক্রিটিকদের সম্বন্ধে একটা গল্প বলি। দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে শোনা।

১৯৮০ সালের মে থেকে আগস্টের মাঝামাঝি তিন মাস সঙ্গীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসকে আকুপাংচার চিকিৎসা করতাম হাঁপানির জন্য। আকুপাংচারের সূচ ফুটানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁর বুকটা হালকা হয়ে যেত। ওই অবস্থায় উনি মনের আনন্দে গান গাইতেন। প্রায় আধ ঘণ্টা সূচ থাকত। আমাকে বলতেন, বুঝলেন ডাক্তার, দিনের এই সময়টা আমার খুব ভালো কাটে। একদিন ছাড়া যেতাম, প্রায় প্রতিদিন গান শুনতাম। চিকিৎসা হয়ে গেলেও দেড় দু ঘণ্টা আমাকে আটকে রাখতেন, গল্প করতেন। একদিন একটু অনুষ্ঠানের রিভিউ দেখে উনি বললেন সব দেশের ক্রিটিকরা একই রকমের।

১৯৫০ দশকের শুরুতে ভারত-চিন মৈত্রী সমিতির এক শুভেচ্ছা প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে চিনে গিয়েছিলেন। 'গুজ রহা হ্যা চার ওর হিন্দি চিনি ভাই ভাই' গানটা প্রায় প্রতি অনুষ্ঠানে গাইতে হত। গানটির রচয়িতা এবং সুরকার সম্বন্ধে এক চিনা ক্রিটিকের অদ্ভুত লেখা পড়ে উনি তো অবাক। তখন উনি চিনা বন্ধুদের বললেন যে আপনারা ভাববেন না, পৃথিবীর সব দেশেই ক্রিটিকরা এই রকমের। তাহলে শুনুন আমাদের দেশের এক গল্প। বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা ছিল। তাঁর একবার শখ হল রাজসভায় হরবোলাদের দিয়ে বাচ্চা বাঘের ডাক শুনবেন। ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা হল। অনেক হরবোলা যোগ দিল। ক্রিটিকরা বিচারক। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পুরস্কার ঘোষণা হল। কিন্তু রাজা খুশী হলেন না। বলল ছোটবেলায় এক হরবোলার ডাক শুনে অবাক হয়ে যেতাম। সেই হরবোলাকে তো দেখছি না। তাকে নিয়েই আবার প্রতিযোগিতা করা হোক। রাজার লোক ওই হরবোলাকে খুঁজে বের করল। বুড়ো হয়ে গেছে। বলল, এখন তো বুড়ো হয়ে গেছি, ভালো পারি না। কিন্তু রাজার ইচ্ছা। বুড়ো বলল তাহলে ছয় মাস সময় দিন, তার পরে যাব। সেই অনুযায়ী ছয় মাস পরে আবার হরবোলা প্রতিযোগিতা। ক্রিটিকরা বিচারক। রাজা বুড়ো হরবোলাকে দেখে খুশী। বুড়ো গায়ে চাদর জড়িয়ে এক কোণে বসে আছে। প্রতিযোগিতা শেষ হল। বিচারকরা বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করল। কিন্তু বুড়োর নাম কোথাও নেই। তখন রাজা বুড়ো হরবোলাকে কাছে ডাকল। কিছুটা সান্ত্বনার সুরে বলল, প্রতিযোগিতায় তুমি কোনও স্থান পাওনি দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে। আমিই তোমাকে জোর করে আনিয়েছি। এখন বয়স হয়েছে তাই বুঝি বাচ্চা বাঘের ডাকটা ভালো পারনি। তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। বুড়ো একটু নীচু হয়ে রাজার কাছে গিয়ে বলল আমার জন্য দুঃখ করবেন না। আমার দুঃখ হচ্ছে এই বেচারার জন্য। বলে বুড়ো চাদরে ঢাকা সত্যিকারের বাঘের বাচ্চাটাকে দেখাল।

এক মনোরম উপত্যকার মাঝে মদমহেশ্বর

(২য় পর্ব)

সমীর কুমার ঘোষ

এগারোটায় আবার পথ চলা শুরু। এবার প্রচণ্ড চড়াই। পথে জল নেই। নেই কোন সুন্দরী ঝর্ণা। ৯ কি.মি. টানা চড়াই ভেঙে উঠতে হবে চৌখাম্বা পর্বতের পাদদেশে মহমহেশ্বর পাহাড়ের এক মনোরম উপত্যকায় শিবশম্ভুর মন্দিরে। মালবাহকদের বলা ছিল গৌন্ডার বা বানতোলি থেকে দুটো ঘোড়া জোগাড় করতে স্বপন আর দুলালীর জন্য। ওদের হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে চড়াই পথে। তবে, দেখি ঘোড়াদুটিতে পালা করে সওয়ারী হচ্ছেন রবিদা ও শম্ভুদা। টানা চড়াই। মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে। পথের ধারে দাঁড়িয়ে একটু দম নিই। হিমালয়ের এমনই মহিমা কয়েক সেকেন্ড দাঁড়ালেই পথশ্রম নিমেষে দূর হয়। দু-চোখ মেলে দেখি মনমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। সুউচ্চ থামের মতো মোটা মোটা পাইন গাছগুলো অফুরন্ত ডালপালা বিস্তার করে সরু সরু কাঠির মতো পাতা ঝুলিয়ে যেন নীল আকাশের নীচে চাঁদোয়া টাঙিয়ে রেখেছে আর এরই মাঝ দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে বরফ ঢাকা চৌখাম্বা পর্বতমালা। সবুজ বনানীর মাঝে শ্বেত শুভ্র উত্তুঙ্গ পর্বতমালা বার বার দেখা দেয়। দু পা করে চড়াই ভাঙি, একটু দাঁড়াই আর প্রাণ ভরে দেখি এই নৈসর্গিক দৃশ্য। দেখি, বার বার দেখি, তবুও যেন তৃপ্তি মেটে না। সারাটা পথ জুড়ে প্রকৃতির ক্যানভাসে যেন ছবি ফুটে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। আমাকে বার বার এভাবে দাঁড়াতে দেখে রবিদা ভাবেন আমি হয়ত চড়াই ভাঙতে পারছি না, তাই উনি বলেন— সমীর তুমি কিছুটা চড়াই পথ ঘোড়ার পিঠে চল তাহলে কষ্ট কম হবে। উত্তরে বলি আমি একদম ঠিক আছ। কোনও কষ্ট নেই। এই নয়নাভিরাম দৃশ্যের স্বাদ নিতে নিতে আমি দিব্যি হাঁটছি।

পথে এক জায়গায় দেখি মালবাহকরা বোঝা নামিয়ে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করছে। আমাদের থামতে বলে। জায়গাটার নাম বলে নানু, উচ্চতা ৬০৪২ ফুট। দুলালী ব্যাগ থেকে কয়েকটা মিছরির টুকরো বের করে হাতে দেয়। জল নেই। মিছরি চুষলে কিছুটা তৃষ্ণা নিবারণ হয়। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চড়াই ভাঙা চলতে থাকা। পথের ধারে এক জায়গায় দেখি একটা ছোট্ট সাপ, সারা শরীরে বিচিত্র সব নক্সা তাতে নানা রঙের প্রলেপ ভারী সুন্দর দেখায়। অনেকটা কালনাগিনীর মতো দেখতে। সাপটি দ্রুত উঠে পাথরের একটা খাঁজে আশ্রয় নেয়। আমি দাঁড়িয়ে থাকি মালবাহকদের অপেক্ষায়, ওরা এলে দেখাই, বলে বিষ আছে, নাম পাহাড়ী চিতে। দলের সদস্যদের দেখিয়ে বলি ওকে বিরক্ত কোর না, যেমন আছে থাকতে দাও, আমাদের ক্ষতি না করলেই হল।

বেলা বাড়ছে। সূর্যদেব এখন মাথার উপর বিরাজ করছেন। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে শরীর ক্লান্ত। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। বাঁক ঘুরতেই পাইনের ফাঁকে দিগন্ত বিস্তৃত পর্বতমালা দর্শনে মনে প্রশান্তি

আনে। মুখে এসে লাগে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা। পাইনের সরু কাঠি পাতা দুলে উঠে শির শির করে শব্দ তোলে। নিমেষে পথশ্রম দূর হয়। পথের পাশে দেখা পাই রডোডেনড্রন ফুল গাছের, পিংক রংয়ের ফুল ফুটেছে। ফুটেছে আরও কত রকম ছোট ছোট ফুল। পাহাড় যেন হাসছে। তারা যেন হেঁসে হেঁসে, দুলে দুলে আমাদের সম্ভাষণ জানায়, যেন বলে তোমরা তো প্রায় এসেই গেছ আর একটু এগোলেই তোমাদের অভিপ্সীত লক্ষে পৌছে যাবে। সত্যিই তাই। কিছুটা পথ পেরিয়ে বনের শেষে পাই সমতল পথ। পথের শেষে তিনদিক উঁচু পাহাড়ে ঘেরা সবুজ উপত্যকার মাঝে দূরে মন্দিরের চূড়া। গাছপালা শূন্য স্নিগ্ধ সবুজ ময়দানের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন মত্ত মহেশ্বর। ঘাসের মধ্যে বিচিত্র রঙের নাম না জানা নানান ফুল। যেন রঙীন কার্পেট বিছানো। পরে মন্দির। আরও দূরে আকাশচুম্বী তুষারাকৃত পর্বতরাজি ঘিরে রয়েছে দেবাদিদেবের মন্দিরকে। বিকেলের মিঠে আলোয় সব কিছু যেন মোহময় হয়ে ওঠে। দেখে মনে হয় সবুজ মখমলী চাদরে ঢাকা নিস্তব্ধ পাহাড়ী উপত্যকার মাঝে ধ্যানরত দেবাদিদেব মহাদেব বিশ্বের কল্যাণে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। ধ্যান ভাঙে ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘণ্টার টুং টাং আওয়াজে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই ভোলা মহেশ্বরের মন্দির চত্বরে।

সোয়া চারটায় পৌছে যাই পঞ্চকেদারের মধ্যম কেদার বা মদ্‌মহেশ্বরে (১১৪৭৪ ফুট)। মন্দিরের চাতালে মালবাহকরা মালপত্র রেখে অপেক্ষা করে। ঠিক এ সময় PWD-র এক কর্মীবন্ধু বলেন মন্দিরের বাঁদিকে যে উঁচু পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে ওখানে উঠলে চৌখাম্বা, ভাগীরথী, নীলকণ্ঠ ও কেদারনাথ শৃঙ্গ ইত্যাদি পরিষ্কার দেখা যাবে। কেউ এ সময় যেতে চায় না। এদিকে এতগুলো পর্বতচূড়ো দেখার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অগত্যা সাথীদের বলি তোমরা অতিথিশালায় বিশ্রাম নাও আমি একটু ঘরে আসি। বলে একাই পাহাড়ে উঠতে থাকি। ১$^{১}/_{২}$ থেকে ২ কি.মি. ৮০০ বা ৮৫০ ফুট উঁচুতে উঠতে হবে। কোন পথ নেই, যেখানে যেমন সুবিধা হয় ঠিক তেমন ভাবেই ওঠা। ঘাসে ছাওয়া সবুজ পাহাড়ের গায়ে ফুটে আছে ছোট ছোট রং বেরংয়ের অজস্র ফুল। ছোট ছোট জুনিপারের ঝোপ ঠেলে কিছুটা পথ উঠতে পৌছে যাই পাহাড় টপে। চোখের সামনে খুলে যায় প্রাকৃতিক এ্যাম্পিথিয়েটারের এক অভিনব দৃশ্য। কত শ্বেত শুভ্র চির তুষারময় পর্বতমালা মাথা তুলে ঘিরে রেখেছে সমগ্র উপত্যকাটিকে। দেখতে দেখতে কোথা থেকে মেঘের পর্দা এসে ঢেকে দিয়ে নিয়ে যায় দৃষ্টির অন্তরালে। চোখ ফেরাতে দেখি পাহাড়ের উপর কিছুটা জমি সমতল। সেখানে রয়েছেন বুড়া মহমহেশ্বরের লিঙ্গ মূর্তি। পাশে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি ছোট বড় পাথর। মন্দির নেই। জনমানবহীন স্থানটিতে ঝোপ, জঙ্গল রয়েছে যথেষ্ট। মাংসাশী প্রাণীর পায়ের ছাপ ও মল চোখে পড়ে। ঠিক করি কাল প্রত্যুষে এখানে এসে সবকটি পর্বতচূড়া প্রাণভরে দেখব। প্রবল বাতাসের মাঝে মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে নামতে থাকি। এই পথটুকু উঠতে লেগে ছিল আধ ঘণ্টা, নামতে লাগল পনেরো মিনিট। নামার সময় দেখি এক বিশাল উপত্যকার মাঝে পাথরের মন্দির অনেকটা কেদারনাথের আদলে। মন্দির প্রাঙ্গন থেকে সঙ্গী সাথীরা হাত নেড়ে ইশারায় বলে নেমে আসতে। দ্রুত নেমে আসি ফুল গাছ মাড়িয়ে। পা পিছলায়, একটু দাঁড়াই, আবার নামি। এভাবেই এক সময় নেমে এলাম মন্দিরের দোরগোড়ায়।

সন্ধ্যায় পুরোহিত ঠাকুর মন্দিরে আসতে বলেন। সন্ধ্যারতি দর্শনের জন্য। মন্দির কেদারের মত পাথরে গড়া। দক্ষিণ মুখী। দেবতা এখানে পাথরের শিবলিঙ্গ মূর্তি তথা মহিষরূপী শিবের নাভি। ঈষৎ উত্তরে হেলান। মূল মন্দিরের পিছনে রয়েছে আরও দুটি ছোট মন্দির একটিতে কষ্টি পাথরের চতুর্ভুজ শিব পার্বতীর যুগল মূর্তি। জটাজুটধারী শিব ঠাকুরের মূর্তিটির ভাস্কর্য অসাধারণ। দ্বিতীয় মন্দিরে রয়েছেন প্রস্তর নির্মিত দেবী পার্বতী। মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় চোখে পড়ল এক পাশে রাখা রয়েছে কাঁসর ও ঘড়ি। আমি কাঁসর তুলে নিয়ে বাজাতে থাকি। এতটা কষ্টকর পথ অতিক্রম করে দেবাদিদেবের মন্দিরে মৃদু আলোয় ভগবানের আরতি দেখে মনটা ভরে গেল। ঠিক যেমন কিছু পূর্বে শরীরের ক্লান্তি ভুলিয়েছিল পথের অতুলনীয় নৈসর্গিক শোভা, এখন দেব দর্শনে দূর হল মনের ক্লান্তি। কেদারের মত মদমহেশ্বর মন্দিরও বন্ধ থাকে দীপাবলি থেকে অক্ষয় তৃতীয়া। এসময় দেবতা অধিষ্ঠান করেন উখিমঠে।

পুজোর পর মন্দির চাতালে পুরেহিতের পাশে বসে মদমহেশ্বর প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বলেন— কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধের পর আত্মীয়-পরিজন নিধনের মহাপাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পঞ্চপাণ্ডব মহর্ষি বেদব্যাসের পরামর্শে পাপস্খলনের জন্য হিমালয়ে আসেন দেবাদিদেব শিবশম্ভুর দর্শনে। অন্তর্যামী ভোলামহেশ্বর ওদের দর্শন দিতে অনীহা প্রকাশ করে পালিয়ে বেড়ান। নাছোড়বান্দা পঞ্চপাণ্ডবও পিছু নেন শিবের। শিব তখন মহিষরূপ ধারণ করে পালাতে থাকেন পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে। অকস্মাৎ মহাবলী ভীমসেন জাপ্টে ধরেন মহিষরূপী শিবের পশ্চাদভাগ কেদারে। মহিষরূপী শিবের অঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে গাড়োয়াল হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে— কেদারে পশ্চাদভাগ, মদমহেশ্বরে নাভি, তুঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে জটাজুট মুখমণ্ডল, কল্পেশ্বরে জটা। গাড়োয়ালের এই পাঁচ পুণ্যভূমি পবিত্র হিন্দুতীর্থক্ষেত্র হল পঞ্চকেদার।

এছাড়াও শিবলিঙ্গ কেন হেলান— এর কারণস্বরূপ আর একটি কাহিনীর অবতারণা করেন যা অনেকটা বাংলার হুগলী জেলার অন্তর্গত তারকেশ্বরের মাহাত্ম্য কথার মতো। বহুকাল আগে প্রত্যেকদিন একটি দুধেল গাই দলছুট হয়ে এখানে এসে শিবলিঙ্গের উপর দুধ ঢেলে দিত বাঁট থেকে। গরুর মালিক দুধ না পেয়ে সন্দেহের বশে একদিন গরুর পিছে ধাওয়া করেন। এ স্থানে এসে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান, দেখেন শিবলিঙ্গের উপর গরুর বাঁট থেকে অঝোর ধারায় দুধ ঝরে পড়ছে। এই দেখে গরুর মালিক রাগে অন্ধ হয়ে গরুকে সজোরে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলে চোখের পলকে গাইটি অদৃশ্য হয় এবং লাঠি গিয়ে পড়ে শিবলিঙ্গের মাথায়। সেই থেকে শিবলিঙ্গ ঈষৎ হেলে আছেন।

আলো ফোটার অনেক আগেই ঘুম ভাঙে। ভোর পাঁচটা। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন মদমহেশ্বর ভ্যালি। সঙ্গীদের প্রস্তুত হতে বলি। পাহাড়ে চড়তে হবে। দেখতে হবে প্রভাতী চৌখাম্বা, কেদারনাথ, নীলকণ্ঠ শৃঙ্গমালাকে। সকলে প্রস্তুত হই অতি দ্রুত। শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে পাহাড়ে চড়ে মন ভরে গেল। প্রতিটি পর্বতশৃঙ্গই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যেন রূপের মুকুট শিরে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে আদি অনন্ত কাল ধরে। এখন নীল আকাশে মেঘের চিহ্ন মাত্রও নেই। দমকা বাতাস এখন প্রবাহিত হচ্ছে না। নীলাকাশের নীচে এই বিশাল

পর্বতমালা অর্দ্ধচক্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে। মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি। প্রণাম জানাই বিশ্ব প্রকৃতির এহেন এক অনবদ্য সৃষ্টিকে। এমন অফুরান নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। শুধু দেখি, প্রাণভরে দেখি। এভাবেই কেটে যায় প্রায় এক ঘণ্টা। ছবি তুলি, শম্ভুদা মুভি ক্যামেরায় ছবি তোলেন। রবিদার উৎসাহ সবথেকে বেশি উনি নানান এ্যাঙ্গেল থেকে বহু ছবি তোলেন। মেয়েরা এসময় ভূর্জপত্র সংগ্রহে মেতে ওঠে। এরপর নামার পালা। শিশির ভেজা ঘাসে বসে শ্লিপ করে কেউ কেউ নামতে থাকেন।

শৃঙ্গ দর্শনের পর টিলা পাহাড় থেকে নেমে আমরা সোজা চলে যাই মন্দিরে। পুজারী বলেন পুজোর সময় হয়ে গেছে। পুরোহিত আমদের দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি ও পুজোর আনুষঙ্গিক ক্রিয়া কর্মাদি সম্পন্ন করান। যাত্রার শুভ কামনা করে হলুদ চন্দনের তিলক পরিয়ে যাত্রার অনুমতি দেন। ইতিমধ্যে, মালবাহকরা জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে বাঁধা ছাঁদা করে প্রস্তুত। প্রাতঃরাশ সেরে দশটায় আমরা মহমহেশ্বর থেকে যাত্রা শুরু করি লেঁখের উদ্দেশ্যে।

সমস্ত পথটাই উৎরাই। হুড় হুড় করে সবাই নেমে চলি। চড়াই পথে চলতে দম লাগে আর উৎরাই পথে হাঁটুতে পড়ে প্রচণ্ড চাপ। শরীরের সমস্ত ভারটাই পড়ে হাঁটুর উপর। স্বপনের পায়ে চোট আর দুলালীর রয়েছে হাঁটুর সমস্যা। উৎরাই-এ ওদের বেশ কষ্ট হচ্ছে। সেজন্য ওদের দুজনকে দুটো ঘোড়ায় চড়িয়ে দেওয়া হোল। আমরা বাকী আটজন হাঁটতে হাঁটতে নামতে থাকি। আজ আর দাঁড়িয়ে দম নেবার প্রশ্নই নেই। এক নাগাড়ে অনেকটা পথ নেমে আসতে বিশেষ কষ্ট হয় না। তবে মাঝে মধ্যে একটু দাঁড়িয়ে পা দুটোকে সামান্য বিশ্রাম দিলে ভাল লাগে। দাঁড়াতে হয় পিছিয়ে থাকা সহযাত্রীদের জন্য।

গতকালকের মতো আজও পথে একটা ছোট পাহাড়ী চিতে সাপ দেখলাম। সাপটা পথের ধারে ছিল। পায়ের আওয়াজ পেয়ে সাপটা পাথরের খাঁজে আশ্রয় নেয়। পথ গাছের পাতায় ভর্তি। বার বার পা পিছলায়। হাতের লাঠির সাহায্যে ভারসাম্য বজায় রেখে পথ চলি। অনেকটা পথ চলার পর দেখি সওয়ারী বিহীন হয়ে ঘোড়া দুটি নেমে আসছে। ব্যাপারটা কি? সহিসদের পথে আটকাই, জানতে চাই, সওয়ারী কোথায়? বলে ওরা হেঁটে আসছে। কিছু পরে স্বপন নেমে আসে, আরও কিছু পরে নেমে আসে দুলালী। ওর কেউ আর ঘোড়ায় উঠতে চায় না। বলে উৎরাই পথে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা খুবই কষ্টকর; শুধু মনে হয় ঘোড়ার সামনে হুড়মুড় করে ডিগবাজী খেয়ে পড়ে যাব। ওদের দেখে মনে হল সত্যিই খুব কষ্ট পেয়েছে ঘোড়ায় চড়ে নামতে। এরপর অনেক বুঝিয়ে তাতে কাজ না হওয়ায় রবিদা ধমকে ওদের জোর করে ঘোড়ায় চড়িয়ে দেয়।

সকলে নামতে থাকি। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দেখি ফেলে আসা সর্পিল পথ রেখা। গাছের ফাঁক থেকে দেখি তুষারাবৃত পর্বতমালা। কিছুটা পথ পার হতে দেখি পাহাড়ের ঢালে একদিকে পাইনের জঙ্গল আপরদিকে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ তরঙ্গের মতো পর্বতশ্রেণী। আরও দূরে চৌখাম্বা যেন রাজার মতো কর্তৃত্ব করছে। সত্যিই প্রকৃতির এক অনবদ্য সৃষ্টি। বার বার দেখেও মন ভরে না। শুধু মনে হয় আবার দেখি, ঘুরে ফিরে আবার দেখি হিমালয়ের অনন্য সৌন্দর্য্য।

বেলা বারোটা। মাথার উপর সূর্যদেব বিরাজ করছেন। আমরা এসে পৌঁছলাম নানুতে। মহমহেশ্বর থেকে প্রায় ৬ কি.মি. পথ নেমে এসেছি। নানুর উচ্চতা ৭০৪২ ফুট। এখানে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটা। মাত্র ৩ কি.মি. হাঁটলেই পৌঁছে যাব বানতোলি। ঠিক ছিল বানতোলি পৌঁছে দ্বিপ্রাহরিক আহার সারবো। আমাদের পৌঁছানর আগেই মালবাহকরা পৌঁছে খাবার দাবার খুলে সাজিয়ে বসে পড়েছে একটা পাথরের চাতালে। রবিদা বলেন— আধ ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া পর্ব চুকিয়ে হাঁটা শুরু করতে হবে। পথ এখন অনেক বাকী। রাঁশু হয়ে যাব লেঁখে। বানতোলি থেকে রাঁশু চড়াই তবে মাঝে মাঝে উৎরাই মেলে।

বিকাল সাড়ে চারটায় রাঁশু পৌঁছে সামান্য বিশ্রাম। চায়ের দোকান আছে। চা পর্ব চুকিয়ে মালবাহকদের সাথে পথ ধরি লেঁখের। রাঁশু থেকে লেঁখ ৫ কিমি চড়াই উৎরাই-এর মিশ্রণ। দলের সকলে এখনও রাঁশুতে এসে পৌঁছয়নি, সকলের জন্য অপেক্ষা করতে হলে লেঁখে পৌঁছতে বিলম্ব হবে, তখন ঘর পাওয়ায় হবে মুশকিল। তাই আলো থাকতে লেঁখে পৌঁছে ঘরের ব্যবস্থা করার জন্য এগোতে থাকি। এই পথটুকু অতিক্রম করতে সন্ধ্যা নামে। আজ অনেক পথ হাঁটা হয়েছে। শরীর শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দাঁড়াই, বুক ভরে শ্বাস নিয়ে শরীরটাকে সতেজ করে এগোতে থাকি। এদিকে ধাপে ধাপে চায়ের জমি তৈরি করে গ্রামবাসীরা নানান ফসল ফলিয়েছে। কলাগাছও রয়েছে প্রচুর।

সন্ধ্যা সাতটায় পৌঁছে গেলাম লেঁখে। আশ্রয় পেয়েছি সেই স্কুল বাড়িতে। এখনও আলো রয়েছে। অন্ধকার নামবে আটটায়। আজ সকলে ভাত খেতে চেয়েছে। তাই রান্না হয় ভাত, ডাল, ঝিঙে আলু পোস্ত, বেগুনী, পাঁপড়, চাটনী ইত্যাদি। খাওয়া দাওয়ার পর্ব মিটতে দশটা বেজে যায়। বিছানায় শুয়ে হিসাব করে দেখি মদমহেশ্বর থেকে লেঁখ প্রায় ২০ কিমি পথ আজ অতিক্রম করেছি।

বিছানায় বসে স্বপন হাঁটুতে ব্যাথার মলম লাগায় আর স্বগোতোক্তি করে বলে— এ্যাত কষ্ট করে হিমালয়ে আসা কেন? উত্তরে বলি— হিমালয়ের আকর্ষণটা কেমন বোঝাতে গেলে বলতে হয় অনেকটা সেই নিশির ডাকের মতো। যে একবার ওই ডাক শুনেছে তাকে যে করেই হোক ছুটে যেতে হবে। এও ঠিক তাই। যে এর ডাকে একবার সাড়া দিয়েছে তাকে বার বার ছুটে আসতেই হবে। না এসে উপায় নেই। পথের কষ্ট, বিপদ-আপদ, কত অসুবিধা এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি, এ কষ্টের স্মৃতি মনে শিকড় গাঁথে না— যে অপার আনন্দ ও অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের স্মৃতি মনে সঞ্চয় করে নিয়ে যাচ্ছি, সেটাই চিরজীবন মনে ভরে থাকবে। বার বার স্মৃতি হয়ে ফিরে আসবে। হয়ত তাই, বার বার এই হিমের আলয়ের পথে টেনে আনে আবালবৃদ্ধবণিতাকে।

১ এপ্রিল থেকে ২০২৩ - ২০২৪ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিশু মঙ্গল

মৃণাল দত্ত

শিশুদের বাচ্চা বললে আমি কুপিত হই।

কিশোরকালে ঝগড়ার সময় প্রথম বাচ্চা শুনি
শুওরের বাচ্চা, গাধার বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা এমন কি
হারিমির বাচ্চাও শুনেছি।

মানব শিশুদের কেন বাচ্চা বলা হবে। তারাতো
মাতৃগর্ভ থেকে আকাশ গঙ্গায় পৃথিবীতে আসে
হাসলে নরম জ্যোৎস্না বিগলিত হয়...

বাচ্চাদের তো স্কুল নেই
সবই শিশু বিদ্যালয়।

মানুষের কাছে

মৃণাল দত্ত

তোমার কল্পনার ঈশ্বর
বমন করছে ধর্মকথা
আগুন জ্বালছে গাছে লতায়পাতায়
পুড়ে মরছে মানুষ
আগুনে পুড়ে খাক ধর্মপুঁথি

জেগে থাকো হে মানুষ
ভালোবাসা নিয়ে প্রেম নিয়ে
প্রকৃত পৃথিবীর কাছে নত হও
জাগো। জ্বলে ওঠো।।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভায ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেযজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেস্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা
৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা
৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা
৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in